BDP
Assignment Solution
Dce. 2012 & June 2013
Foundation Course in Bengali (FBG)

১/ ঙ) প্রশ্ন ঃ পিঁপড়ের সাধারণ পরিচয় দিয়ে, তাদের শ্রেণি বিবাগ ও কাজ সম্পর্কে পাঠ্য প্রবন্ধ অনুসরণে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত নালসোঁ পিঁপড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ কী-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবন কাহিনী খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। এরা সামাজিক প্রাণী। এরা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে এবংকাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির বহু পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ দলেই সাধারণত স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী এই তিন শ্রেণীর পিঁপড়ে দেখতে পাওযাযায়। কোনো কোনো জাতের কর্মীদের মধ্যে আবার ছোটো কর্মী, বড় কর্মী ও যোদ্ধা এই তিন রকমের বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট পিঁপড়ে দেকা যায়। স্ত্রী ওপুরুষের কাজ কেবল বংশবৃদ্ধি করা এবং বসে বসে খওওয়া। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় বহুধি পিঁপড়ে দেখতে পাওযা যায়। অন্যদিকে কর্মী পিংপড়ের সবরকম কাজ যেমন-খাবারের জোগাড়, বাসা তৈরী, সন্তান পালন–এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ক্রীতদাসের মতো এই কর্মীদেরই করতে হতো। কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ের দলে, হাজার হাজার কর্মী থাকে। আবার কোনও কোনও জাতের দলে কর্মী সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটি মাত্র। অধিকাংশ পিঁপড়েই গর্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষকোটরে বাস করে থাকে। আবর কেউকেউ বড়ো গাছের ওপরে সবুজ পত্র পল্লবের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে। উগ্র প্রকৃতি ও বিষাক্ত দংশনের জন্যে নালসো নামে একজাতীয় লাল রঙের পিঁপড়ে আমাদের দেশে সর্বজন পরিচিত। এরা একরকম কাঠ পিঁপড়ে। এরা এক ধরনের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের বাসা তৈরী করে। হাজার হাজার লালসো এক বাসার মধ্যে একসাথে বাস করে। বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এরা যে রূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয তা কতকটা সংস্কারমূলক হলেও এতে সহজেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নালসো পিঁপড়েরা মাংসাশি প্রাণী, মৃত কীট পতঙ্গ ইত্যাদি খায়, এমনকী জীবন্ত পোকাও মেরে খায়। জীবন্ত ফড়িং বা কোনো পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে সবাই মিলে ছেঁকে ধরে। যাতে উড়তে নাপরে। লালসো পিঁপড়েরা বাসার কাছে ঘেঁসতে দেয না। একবার আক্রমণ করলে তারা কিছুতেই পিছু হটে না, এমনকি মাথা থেকে দেহ আলাদা হয়ে গেলেও কামড়ে ধরে তাকে। শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলেই এরা দেহের প্রান্ত থেকে এবার কম বিষাক্ত রস পিচকরির মতো ছুঁড়ে মারতে থাকে। অন্যান্য পিঁপড়েদের সাথে এরা মারামারি তো করেই, এমনকি নিজেদের জাতের অন্য দলের সাথেও মারামারি করে।

১/চ) প্রশ্ন ঃ 'হাড়' গল্পে ধনী ও দরিদ্র দুটি শ্রেণির যে পরিচয় আছে তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

উঃ– দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা হার গল্পে সাম্যবাদী মানবতাবাদী লেখক দুটি বিপরীত শ্রেণীর চরিত্রের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। একদল অভুক্ত আর একদল ভোগের প্রাচুর্য্যে তীপ্ত। একদিকে লোহার ফটকের মধ্যে কুকুরের পাহারায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের অলস বিলাসী জীবন এবং অন্যদিকে যারা অভুক্ত তারা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ডাস্টবিনের খাবার জানোয়ারের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে এবং হাইড্রেনের নোংরা জল খেয়ে কোনরকমের জীবনধারণ করা। এই দুইয়ের জীবন ধারার বিস্তর ব্যবধানের মাঝখানে মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষ হলেন লেখক, এরা না পারে ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের পাশে দাঁড়াতে। অথচ তাদের সংগতিপূর্ণ মন শোষিত জনতার জন্য ব্যাথাবোধ করে মাত্র, তাদের জন্য কিছুই করতে পারেন না। কারণ তাদের জীবনও তো সংশয়ে ভরা। তাদের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে।

এক সংশয় চিত্তে মধ্যবিত্ত যুবক পিতৃবত রায়বাহাদুর এল.এইচ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে চাকরীর উমেদারী করতে এসেছে। যেটা পেলে হয়তো তার জীবনের ভীত দৃঢ় হতে পারে। কিন্তু এই চাকরিটা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তার সংশয় রায় বাহাদুর এ ব্যাপারে সম্মত হবেন কিনা অথচ তার ধারনা রায় বাহাদুর একটা খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরি। ব্যবহারকরলেও চাকরির ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করতেও প্রস্তুত নয়। তার মত হল কোন এরুটিভ সারভিস্ট-এ ঢুকে 'অ্যাডভেঞ্চারের' অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় না। কিন্তু এই সামান্য চাকরি যে এই মধ্যবিত্তের কাছে কতখানি অসামান্য তা এই খেয়ালী ধনী ব্যক্তির বোধগম্য নয়। যে নাকি তার খেয়াল মেটাতে মন্ত্রসিদ্ধ হাড় কেনে, যার দাম ৫০০০ টাকা।

অপর দিকে বাইরের থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর আত চিৎকার ভেসে আসছিল। একমুঠো ভাতের জন্য তারা জান্তব চিৎকার করছে।

অথবা ডাস্টবিনের জানোয়ারের সঙ্গে কিছু খাবার খোঁজে পেয়ে কলহল চিৎকার করছে। এই উদরভূতির জন্য চিৎকার রায় বাহাদুরের গল্পে ব্যাঘাত তিনি অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করেছেন।

"পার্কের ও গুলোর জালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না"। কিন্তু সাম্যবাদী মানবতাবাদী লেখক বর্তমান জীবনের সংশয় ক্ষয়ে বিচ্ছিন্নতার বেদনা নিয়েও ভবিষ্যতে আশা শোষণ করেন যে ভবিষ্যতের একদিন দরিদ্র্যের হাতের হাড় মন্ত্র সিদ্ধ অস্ত্র হয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পালটে দেবে এ প্রসঙ্গে সাম্যবাদী কমিউনিষ্ট কবি সুকান্তের উক্তি বিশেষ প্রনিধান যোগ্য।

২/ গ) প্রশ্ন ঃ রক্ত কী ? রক্তের কাজ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উঃ– রক্ত ঃ–

রক্ত একপ্রকার অস্বচ্ছ, লবণাক্ত, ক্ষারধর্মী তরল সংযোগ কলা।

রক্তের কাজ ঃ– রক্তের প্রধান কাজগুলি হল ঃ–

১) খাদ্য বস্তু পরিবহন ঃ–

রক্ত অন্ত্র শোষিত সরল খাদ্যবস্তু দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেয়। রক্ত দেহের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্থান থেকে খাদ্য বস্তু দেহের বিভিন্ন কলা শেষে প্রেরণ করে।

২) শ্বাসবায়ু পরিবহণ ঃ–

রক্ত ফুসফুস থেকে O_2 বহন করে কলা কোষে পৌছে দেয়, এবং শ্বসনের ফলে উৎপন্ন Co2 গ্যাসকে ফুসফুসের বায়ু থলিতে পৌঁছে দেয়।

৩) দূষিত পদার্থের অপসারণ ঃ–

কোষে উৎপন্ন বিপাক জাত দূষিত পদার্থগুলিকে রক্ত কোষ থেকে অপসারিত করে দেহের রেচন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৪) পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে ঃ–

রক্ত, হরমোন, ভিটামিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থকে তাদের ক্রিয়ার স্থানে বহন করে আনে।

AMBITION

২/ (ঘ) প্রশ্ন ঃ 'রামমোহন ভারতীয় নবজাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক।'— পাঠ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটির যথার্থতা বুঝিয়ে দিন।

উঃ - ১৯১৫ সালে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে আসেন এবং ক্রমে তিনি কলকাতা তথা সমগ্র ভারতের নবগঠিত সমাজের কেন্দ্রীয় পুরুষ হয়ে ওঠেন। এযুগের বহু সাধকের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দেখি রামমোহনের চরিত্রে। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একমাত্র তিনিই সেই যুগসন্ধি কালের কাল লক্ষণ সঠিক ভাবে চিনেছিলেন। তিনি স্বদেশকে বিশ্বের পটভূমিতে দেখেছিলেন। যুগ - যুগান্তরের বিচ্ছিন্নতার অবসানে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের নতুন মিলনের সম্ভবনাই ইংরেজ রাজত্বের প্রগতি শীল দিক। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্ত তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে যে সীমাহীন জড়ত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছে ইংরেজ জাতির চিত্তের স্পর্শ সেই ভারতবর্ষকে জাগরিত করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার উপায় করে দেবে। তিনিই আমাদের প্রথম আধুনিক চেতনার দীপ্ত মানুষ। আধুনিকতার আলোক দীপ্ত রামমোহনের মন কোন অন্ধসংস্কার বা কোন মোহকেই প্রশ্রয় দেয়নি। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সচেতন থেকেও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং সেই জন্য বাঙালীর লৌক সাধানায় হয়েছিল নবজাতি। ধর্ম, সমাজ শিক্ষায় সংস্কার জাতীয় চেতনার উদ্রেক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতির স্থাপনা - এই ছিল রামমোহনের নবযুগের আদর্শ অর্থাৎ একটা উদার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি ভারতের রূপান্তর বা যুগবিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন। এই সংস্কার মুক্ত দৃষ্টির ফলেই ব্রাহ্মধর্মের সূচনা, সতীদাহ প্রথার সমাপ্তি এবং ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য চিন্তা ধারার প্রবর্তন। যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে রামমোহন হিন্দু - মুসলিম খ্রীষ্টান ধর্মের কুপদ্ধতিগুলি দূর করার চেষ্টা করলেন। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার বিশেষত জাতিভেদ লোপ ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয় তাঁর কাছে জাতীর চেতনা থেকে পৃথক ছিল না। চীন, স্পেন, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সর্বত্রই সংস্কার ও বিদ্রোহের আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত চিন্ত, রামমোহনের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। ইংল্যান্ডে শাসক ইংরেজ সমাজেও তিনি ছিলেন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। স্যার জন বৌরিং, রেভরন্ড পোর্টার, ড্কটর বুট, দার্শনিক বেন্থাম প্রভৃতি ইংরেজরা রামমোহনকে যে ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তাতে তাকে মহামানব বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শুধুমাত্র সমাজ সংস্কার হিসেবে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখক নন। তাঁর রচনায় যে উৎকৃষ্ট গদ্য - শৈলী গড়ে উঠেছিল এমনও নয়। কিন্তু তিনিই গদ্যভাষা অবলম্বন করে যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি প্রস্তুত করে গেছেন, বাঙালী প্রতিভা উত্তর কালে যা কিছু সৃষ্টি করেছে, বিশ্বের সম্মুখে যে সম্পদ নিয়ে বাঙালী জাতি সম্মানের আসন দাবি করার অধিকার অর্জন করেছে, তা রামমোহনই সূচনা করে গেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে শুধু

বাংলা গদ্যভাষা বা আধুনিক সাহিত্যেরই নয়। তাঁকে সমগ্র নব্যবঙ্গ সংস্কৃতির তথা আধুনিক ভারতের 'জনক' বা ভারতীয় নব্য জাগতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক বলে মানতে হয়।
সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় -
তিনি নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালী সর্বসাধারণকে রাজটীকা পরাইয়া ছিলেন এবং রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপরে নব নব তল নির্মিত হইয়া সাহিত্য - হর্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবেন।

২/ (ছ) 'সাধু-চলিত', 'লেখ্য-কথ্য' ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
উঃ– সাধু ভাষা হল
সাধু ভাষা হল একান্তই লেখ্য ভাষা।
খ) সাধুভাষায় কাকে তৎসম, সন্ধি-সমাজবদ্ধ, বহু অপ্রচলিত ও আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য।
গ) সাধুভাষায় দেখা যায় ক্রিয়ার দেয় ও যুক্তপ্রক্রিয়া পাদেয় প্রাচীন রূপ। যেমন– আসিয়াছেন।
ঘ) সাধুভাষায় লক্ষ্যণীয় সর্বনাম পদের প্রাচীন ও পূর্ণরূপ। যেমন– ইহাদের।
চলিত ভাষা
ক) চলিত ভাষা প্রধানতঃ সুখের ভাষা।
খ) চলিত ভাষায় দেখা যায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ– এসেছেন।
গ) চলিত ভাষায় দেখা যায় এগুলির বর্জন ও কার্য দেশী শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য।
ঘ) চালিত ভাষায় লক্ষ্যণীয় সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ যেমন– এদের।
লেখ্য ভাষা
সাধারণত সাধুভাষা হল একান্তই লেখ্য ভাষা। এই ভাষা সাধারণত আমরা লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। এর একটি পূর্ণতা আছে।
কথ্য ভাষা
সাধারণত কথ্য ভাষা হল একান্তভাবে চলিত ভাষা। আমরা মুখে যে ভাষায় কথা ছিল সেটি হল কথ্য ভাষা। একে আমরা চলিত রূপ থাকি। এর কোনও পূর্ণতা নেই।

৩/ ক) এক কথায় প্রকাশ
দিনের শেষ –অপরাহ্ন
জীবিত থাকার ইচ্ছা - জিজীবিষা
যার কুলশীল জানা নেই - অজ্ঞাত কুলশীল
যে নারী প্রিয় কথা বলে - প্রিয়ংবদা
যে বিদেশে তাকে - প্রবাসী
যার দু'হাত সমান চলে - সব্যসাচী।

৩/(খ) উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লিখুন।
দ্বিস্বর ধ্বনি ঃ–
বাংলায় যৌগিক স্বর মাত্র দুটি ঐ এবং ঔ। এগুলি প্রত্যেকটি দুটি করে স্বরের মিলে গঠিত বাংলার দ্বি স্বরধ্বনি। যেমন– ঐ=ও+ই, ঔ = ও+ঔ। বাংলায় আরো স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন– এই=এ+ই। এখানে দুটি স্বতন্ত্র একক স্বর রূপে উচ্চারিত হচ্ছে না। দুটি মিলিয়ে একসঙ্গে যৌগিক স্বররূপেই উচ্চারিত হচ্ছে। আসলে বাংলায় শুধু দুটি যৌগিক স্বর লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন আছে। অন্য যৌগিক স্বরগুলি লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণচিহ্ন নেই।

অধঃস্বর ধ্বনি ঃ–
যৌগিক স্বরে দুটি স্বরযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি স্বরই স্বতন্ত্র একক স্বরের মতো পূর্ণাঙ্গ নয়। দ্বিতীয় স্বরটি অর্ধোচ্চারিত, এই দ্বিতীয় স্বরটিকে বিশেষজ্ঞরা ঠিক স্বরধ্বনি না বলে অধ স্বধ্বনি বলতে চান। যেমন ঐ=ও+ই এই যৌগিক স্বরের দ্বিতীয় স্বরই হল অর্ধোচ্চারিত। তাই এটি অর্ধস্বর। অর্থাৎ আধখানা উচ্চারিত হওয়া স্বরকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে।
যেমন – 'মই' কথাটির 'ই' উচ্চারিত হচ্ছে আধখানা। এই আধখানা উচ্চারিত স্বরের তলায় হসন্ত দিয়ে বোঝাই। যেমন– ই, উ, এ, ও।
স্বর ঃ– উচ্চারণের সময়ের কম বেশি অনুযায়ী বাংলা স্বর দুই প্রকার। হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। এছাড়া রয়েছে প্লুতস্বর।
অর্ধস্বর ঃ অর্ধস্বর ধ্বনি হল চারটি। সেগুলি হল ই, উ, এ, ও।
ব্যঞ্জন ঃ– ব্যঞ্জন ধ্বনিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী, উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণকে সাতভাগে ভাগ করা যায়। কণ্ঠবর্ণ, তালব্যবর্ণ, মূর্ধণ্যবর্ণ, দন্তবর্ণ, ওষ্ঠবর্ণ, দন্ত্যোষ্ঠবর্ণ ও নাসিক্যবর্ণ।
উচ্চারনের রীতি অনুযাযী ব্যঞ্জনবর্ণকে ১৪ টি ভাগে ভাগ করা যায়। স্পর্শবর্ণ, ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণ, নাসিক্য বর্ণ, উষ্ণ বর্ণ, অন্তস্থ বর্ণষ অর্ধস্বর, তরলাস্বর, পার্শিক ধ্বনি, কম্পনজাত ধ্বনি, শিশধ্বনি, তাড়নজাত ধ্বনি, অর্ধক্যঞ্জন ও আশ্রয়ীভাগ বর্ণ।

মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ–
প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ খ,ছ,ঠ,থ, ফ, এবং চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ঘ,ঝ,ঢ,ধ, ভ, উচ্চারণের সময় শ্বাস বা প্রাণবায়ু বেশি লাগে বলে এই বর্ণগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বা মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হয় অল্পপ্রাণ বর্ণের সঙ্গে হ জাতীয় ধ্বনি যুক্ত হয়। যেমন– খ=ক+হ, ছ=চ+হ, ঠ=ট+হ, থ=ৎ+হ, ফ=প+হ, চ=ড+হ।

৩/চ) রক্ত জমাট বাঁধা থেকে মুক্ত রাখার উপায় কি ?
উত্তর ঃ - শরীরে ভেতর থেকে বর্হিজগতের সংস্পর্শে এসে জমাট বেঁধে যাওয়া রক্তের একটি বিশেষ ধর্ম। কিন্তু রক্তের সাথে হ্যপারিন সোডিয়াম নাইট্রেট অথবা পটাসিয়াম, অক্সেলেট একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে রক্তের জমাট বাঁধা থেকে মুক্ত রাখা যায়।

৩/ (ঝ) প্রশ্ন ঃরক্তকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ? ভাগগুলির নাম লেখ।
উঃ– আমাদের শরীরের ভিতর যে লাল তরল পদার্থ আছে তাকেই রক্ত বলা হয়। এই রক্ত হল এক রকমের বিশেষ ধরনের জীবকোষের সমন্বয়। রক্ত আমাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন কোষে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন ও পাকস্থলী থেকে খাদ্য বহন করে নিয়ে যায় এবং বহিরাগত যেকোনও ধরনের রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।
রক্তকনিকারে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি– যথা– ১) লোহিত কনিকা, ২) শ্বেতকনিকা, ও অপরটি হল ৩) বর্নহীন কনিকা।
লোহিত কনিকার লাল অংশটুকু বলা হয় হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুসে আগত বায়ু থেকে অক্সিজেনকে শোষন করে শরীরের অপরিশোধিত রক্তকে শোধন করা হয়। তাছাড়া খাদ্য পরিবহনের কাজও লোহিত কনিকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়।
শ্বেতকনিকা শরীরের বহিরাগত রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে শরীরকে রোগ মুক্ত রাখার চেষ্টা করে খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ শরীর থেকে নির্গত করে দিতে সাহায্য করে।
বর্ণহীন কনিকার কাজ হল শরীরের ছোট বা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকলে বর্ণহীন কনিকার সাহায্যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। রক্তের মধ্যে লোহিত কনিকার অন্যান্য তুলনায় অনেক বেশী থাকে বলে আমরা খালি চোখে রক্তকে শুধু লালই দেখতে পাই।

AMBITION

BDP
Assignment Solution
Dce. 2012 & June 2013

Foundation Course in English (FEG)

1. (a) Briefly desacribe, in your own words, how Gajpati save the child from hyenas?

Ans: Gajpati, ten feet tall and weighed more than four tons animal belonged to India's Forest Department. As a hunting animal he could force his way through the jungle better than any other elephant. Karim is the keeper of the elephant. Karim, the keeper of the elephant was proud of him.

One afternoon Karim with his wife, baby and the elephant camped near the Rapti River. Taking a big earthen jar Karim's wife went to the river to bring water.Finding her late in coming Karim's anxiety rose. Marking a circle before the elephant Karim placed his baby there to be looked after. Then he ran full speed in search of his wife. The sun disappeared in the western horizon. Hyenas emerged in darkness. The animals heard the baby crying and they began to move to the target. Gajpati sensed something and grumbled. They hyenas emerged in darkness. The animals heard the baby crying and they began to move to the target. Gajpati sensed something and grumbled. The hyenas came close and watched the baby. Angry Gajpati with giant strength shoved the tree to which he was tied. Suddenly he made for the sitting hyena which sprang away quickly. The hyenas again came close and this time he pounced a hyena and stamped to pulp. The baby and the elephant were then undisturbed. In the early morning Gajpati saw the hyenas coming back and the baby and the baby several yards away. The hyenas darted in to have their prey. Gajpati moved on steadily in rage and the chain bit into his flesh. At that time the great tree smashed down upon Gajpati and the baby. The violent noise made the hyenas run off.

2.b) According to Nehru, what lessons can the world learn from India's peaceful evolution into being a free nation?

Ans: The world has experienced two World Wars and their scars are deep enough. This is unfortunate that mankind has not taken proper lesson from the terrible tragedy. The route of disaster that previously expanded should be narrowed for the welfare of mankind. World history shows aggression, invasion that is domination of physical force. The tradition of history is not abolished totally in the present world. The civilization is taking new turn with the passing of days, so the nations are changing their outlook. In this perspective India insists on peaceful evolution. The country always likes to follow the track of co-operation, peaceful understanding and friendly relationship. Physical force can't be the word. The importance of moral forces can't be ignored in the tormented world. Shaking disbelief, skepticism, war like attitude, unnecessary interference in a country's sovereignty, it will be better to keep faith on neighbors, practice tolerance, peaceful discussion on disputed matters and stretching helpful hands.

3. a) What happened when Subhas Chandra Bose visited the Provincial Adviser for studies?

For higher education he chose the subject psychology and planned about researches in it. Before leaving the country he visited the Provincial adviser for studies in England. The Provincial Adviser was a professor of the Presidency College. The honorable person was a former student of Cambridge University. He knew Subhas well and did not possess a high opinion to him. This was because once Subhas was expelled from the college. When he heard Subhas's intention of appearing the ICS examination he frowned. He dissuaded Subhas saying that he was going simply to squander ten thousand rupees. Subhas found discouraging attitude in the Adviser's mentality. Besides there was no chance of help from the Adviser's part to secure admission in Cambridge. So Subhas left him.

AMBITION

3. b) what finally happened to the red rose for which the nightingale died?

Ans: The professor's daughter told the young student to bring a red rose for her. Then she would dance with him. But there were no rose in the garden as it was winter. The student got a red rose at the price of a nightingale's life. He took it to the girl but she refused it as it would not match with her dress. The Chamberlain's nephew sent her some jewels which were more precious than the flowers: The professor's daughter told the young student to bring a red rose for her. Then she would dance with him. But there were no rose in the garden as it was winter. The student got a red rose at the price of a nightingale's life. He took it to the girl but she refused it as it would not match with her dress. The Chamberlain's nephew sent her some jewels which were more precious than the flower.

3.**(i)Why didn't Karim and his wife return home before nightfall**

Ans: In one afternoon Karim with his wife, baby and Gajpati camped near the Rapti river. Karim's wife took a big earthen pot and went towards the river to fill it. Time passed but she did not return it made Karim anxious as the sun was rolling down the west and the wild animals will soon come out. So putting the baby under Gajpati's custody he ran away to see what had happened to his wife. On the other hand when Karim's wife dropped her water jar to fill, rapid current of the river snatched it from her clutch.While she was trying to recover it. She fell into the river and

swept downstream. She saved herself somehow but due to darkness she lost in the jungle and did not come back in time.

4. **e) Essay**

Examination

Examinations are often denounced as a bad system. But they have their uses; and the critics have never yet devised a system which will take their place.

In schools and colleges and government department, examinations are necessary as tests of efficiency. There must be some visible proof that a boy is fit to be promoted to a higher class, the next stage in his education; and there must be some tangible guarantee that a young man leaving college has imbibed a certain amount of knowledge and undergone a certain amount of mental training. And before anyone can be give a responsible post, he must have a chance of showing that he has sufficient intelligence and knowledge to be safely entrusted with the duties of the position. Such a test is of special importance in such practical professions as medicine for no one will want to entrust his health to a man who has not proved that he has sound knowledge of the human body, the laws of health, and the remedies for disease. In all these cases, the only practical test seems to be the examination.

Examinations are also useful as stimulus to work. If a student at college knows there is no examination ahead of him, unless he has the love of acquiring knowledge for its own sake, he will take things easily, and not put in the amount of hard work and systematic study necessary to a sound education.

On the other hand there are no doubt evils connected with the examination system.

For one thing, examinations encourage the habit of cramming. It is quite possible to pass an examination by cramming; but that means that an examination may not be a real test of knowledge. For knowledge acquired by cramming is superficial and easily forgotten, and has no effect in training the intellectual powers.

For this reason, an examination is not an unfailing test of efficiency: for the man who passes may not really be as good as the man who fails, who may have a better rain and sounder knowledge. And an examination is no test of moral qualities, which are the most important of all.

5.(a) Dialogue: You do not get good marks in English. Talk your teacher about your problem

Riya: Hello mam. May I coming

Teacher: Please come

Riya: Mam I want to discuss my problem in English with you.

Teacher: I know. In this exam you get very low marks in English.

Riya: I gave maximum time in this subject. But I am facing problem in learning English

Teacher: Is it so? May I know what type of problem you are facing exactly?

Riya: Mam my first problem is Vocabulary. I am very weak in it. Secondly I don't know how to improve my grammar

Teacher: I think you should follow a good dictionary for improving your knowledge of words. For Grammar, I think it would be better to learn grammar as they appear in the text, instead of learning it separately.

Riya: Thank you mam. I will follow your advice.

Teacher: Don't worry. T promises that in coming exam you will get good marks in this subject.

AMBITION

6. Grammar

(b) Ten people <u>were</u> killed in an accident on Tuesday

(c) <u>Did</u> he go there yesterday?

(j) Rita went out to buy stamps.

(f) Karim requested Gajapati to look after the baby

(h) Look at the dark clouds. It <u>can</u> rain tonight

(d) I have not seen a film since last year.

BDP
Assignment Solution
Dce. 2012 & June 2013
Foundation Course in Humanities & Social Science (FHS)

১/(খ) প্রশ্ন ঃ– বৈজ্ঞানিকমানসিকতা কাকে বলে । বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্য কি কি শর্তাবলী প্রয়োজন ?
উঃ–নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবজ্ঞান অর্জনের যে মানসিক ধারা তাকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বলেই বর্ণনা করা যায় । ভারতের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কথা বিশেষ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । বোধহয় এইজন্য যে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে এটি খুব প্রিয় । এটা রীতিমতো দুঃখের যে যখন বিজ্ঞানের এত বিপুল শক্তি বর্তমান যা মানুষের উপকার লাগে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অকল্পনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে, তখনও লোকে যুদ্ধ ও সংঘাতের কথায় ভাবছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে বজায় রাখতে চাইছে যার ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে । বিশ্বের সমস্যাবলী ও জাতীয় সমস্যাবলীকে বোঝার একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মনোবৃত্তি ।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আবশ্যিক শর্তাবলী ঃ
১ । মনের সক্রিয়তার এক ধারা যা মানসিক জড়তার বিরোধী বিশ্বজগৎ রহস্যে পরিপূর্ণ । প্রাত্যহিক জীবনের এর অর্থ হল যে, যে কাজে নিযুক্ত আছে সেই কাজে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করা এবং তার সাথে যুক্ত নানা প্রশ্নকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিচার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা ।

২ ।আমাদের শেখানো হয় বিশ্বাস একটি মহৎ গুণ । এটি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি, কিন্তু আমি মনে করি এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা । বর্তমানে মানবজাতির খুব কম সংখ্যক নয়, বরং খুব বেশি সংখ্যকই বিশ্বাস থেকে ভুগেছে । ফলে বিশ্বাস নয়, সন্দেহ চাই আজ প্রচার করা প্রয়োজন । আধুনিক বিজ্ঞান সন্দেহের বড় বড় ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে ।

৩ ।সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা থেকে যেন রহস্য ও নিষ্ক্রিয়তা জন্ম না নেয়, বরং সাক্ষ্য প্রমান, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য আরও সক্রিয়তা সৃষ্টি হয় যাতে আরও নির্ভরযোগ্য মতামত ও অনুসিদ্ধান্ত গড়ে তোলা যায় । বিশ্লেষণও একটি যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া তথ্যগুলিকে যাচাই করার সময় যুক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । এটা যেন এমন না হয় যে, একজন ইংরেজ একজন ভারতীয়কে লণ্ডনের রাস্তায় থুতু ফেলতে দেখালেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সব ভারতীয়রাই নোংরা স্বভাবের । বস্তুতঃ আমরা লঘু জাতি বা গোষ্ঠীর লোকেদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে স্বল্প সাক্ষ্যপ্রমান থেকে নানা ধারণা তৈরি করি ।

৪ । যুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে তাকে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমাদেরথাকাউচিত । এমনকি যদি এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজের কোন প্রিয় ধারণা অথবা ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচলিত কোন ধারণার বিরুদ্ধে যায় । অন্যভাবে বলা যায় যে, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন্ ধারণাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সংস্কার থাকা অথবা তাকে এড়িয়ে চলা উচিত নয় । বৈজ্ঞানিক মনোভাবের একটি দিক হল কোন্ মতামত পোষণ বা ব্যক্ত করার ব্যাপারে ঔদ্ধত্যের বদলে বিনয় দেখানো । অন্যদিকে, বিগত শতাব্দীগুলিতে মানুষের অর্জিত কৃতিত্ব আমাদের মনোবিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্পর্কে এই আস্থা সৃষ্টি করেছে যে বিজ্ঞান অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে পারে এবং আজকের অসমাধিত সমস্যাবলীর সমাধান হয়তো কাল সমাধান করবে । মানবীয় প্রয়াসের উপর আস্থার বল আবিষ্কার অনুসন্ধান ও সৃজনমূলক সক্রিয়তার বৃত্তি উপরোক্ত এইসব বৈশিষ্ট্য হল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের চরিত্রিক লক্ষণ । অবশ্য সাথে রয়েছে কটোর ধারাবাহিক কর্মোদ্যোগ এবং আচরণ ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি ।

প্রতিটি দেশ ও জাতির উন্নয়ণের পক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অবশ্যাম্ভাবী ও অনিবার্য । কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োগের চাইতে অতিরিক্ত কিছু প্রযোজন । তা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি । বিজ্ঞান সম্পর্কে দুঃসাহসিক মনোভাব । এভাবে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নানাভাবে সমাজে কাজ করে থাকে ।

১/ (গ)প্রশ্ন ঃ–ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান বর্ণনা করুন ।
উঃ–শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের সম্পর্কে কি যুক্তিযুক্ত সমাজের এই ধারণাটি তাদের সেইক্ষেত্রে প্রবেশের পথ নির্ধারণ করেছে । ঐসব বিধিনিষেধের মোদ্দা কথা হল নারীর প্রাথমিক ভূমিকা গৃহে এবং গৃহস্থালীতে । গৃহের প্রয়োজনে এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচি, জীবিকা, পেশা সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারে না । বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, নারী অ -কৃষি খাতে, ছোটোখাটো ব্যবসায়ে স্বনিযুক্ত হয়ে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে অথবা পোষাক তৈরি, বিড়ি বাঁধা, চুড়ি তৈরি, ইরামতী কাজে, যন্ত্রাংশ সন্নিবেশের কাজে নিযুক্ত থাকে । তামাক চাষে অথবা লেস তৈরিতে নিযুক্ত নারীশ্রমিকের দুরাবস্থার কাহিনি টেলিভিশনের অবাণিজ্যিক তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে । অর্থনীতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাইরের কাজে নারীর সুযোগ আসলেও তাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে ।

ভারতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বর্তমান থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক ও যৌথ পরিবারেরই প্রাধান্য বর্তমান । স্বামীর গৃহে বসবাস সহ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বিবাহের পর নারী লিঙ্গ সমতার সেরকম সুষ্ঠ পরিবেশ পায় না । পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারে শ্বশুড়ী এবং ননদের হাতে বধূদের যেরূপ নিগৃহীতা ও নির্যাযিতা হতে হয় – এসব কাহিনী বহু লোকগাথায় ও গানে অমর হয়ে আছে । ঐ পরিবারে বধূরা সম্পূর্ণভাবে শ্বাশুড়ী ও ননদের কর্তৃত্বাধীন । কর্মরতা নারীদের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি ভাসা ভাসা ধারণা আছে যে তাদের সংসারের দায়িত্ব তেমন একটা পালন করতে হয় না । কিন্তু বিশদ্ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এসব ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার তিন প্রজন্মের পরিবার নয়, বরং কোন দম্পতির সঙ্গে হয় পিতা, নয়ত মাতা বাস করছেন ।

নারীর জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । শাস্ত্রমতে, বিবাহ-ই একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নারীর পক্ষে । এছাড়া, সমাজ যখন নারীর সতীত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, দাম্পত্য সম্পর্কের স্থায়িত্ব সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান । বৈধব্য - বিচ্ছেদ, একক নারীজীবন পুরুষের লোভ লালসার লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠতে পারে । নারীর পক্ষে বিবাহ বাধ্যতামূলক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের অধিকতর অবমূল্যায়নের ক্ষেত্র হল পণপ্রথা । কোন কোন গোষ্ঠীর মর্যাদা পরম্পরায় কন্যাপক্ষের বিবাহ দিতে হলে বাবা -মা'কে বা পাত্র পক্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী দিতে হয় । দেহ ও মনকে মেলাবার জন্য এটি একটি প্রকাশ্য বাণিজ্যিক লেনদেন ছাড়া আর কী হতে পারে ? নারী অবশ্যই সমাজের যূপকাষ্ঠে

AMBITION

বলিদান বই নয়, সমাজের আধুনিকীকরণে এই প্রথা কিছুমাত্র কমেনি, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল যে, উচ্চশিক্ষিতা ও চাকুরীরতা মেয়ের বিয়েতেও পণ দিতে হয় বাবা -মা'কে। পণপ্রথা দরিদ্রশ্রেণির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। এই পণপ্রথা প্রমান করে যে, নারী সম্বন্ধে গোটা সমাজের চূড়ান্ত অমানবিক মনোভাব এবং নতুন প্রজন্মের চরম বৈষয়িক অভিরুচি। নারীর নিম্ন অবস্থানের আরও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুরতম প্রমান হল – পণপ্রথা'র বলি হিসেবে বধূ -মৃত্যু। অন্যদিকে, সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত -এর দোহাই দিয়ে নির্যাযিতা কন্যার বাবা-মা এবং পরিবারে তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। ফলে কোথাও কোনস্থানে শান্তি না পেয়ে সে বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে পণপ্রথাজনিত মৃত্যু এক নির্মম ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

সমাজে নারীর নিম্নমানের আরেকটি সূচক হল – লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য। সাধারণভাবে জনসংখ্যার লিঙ্গানুপাতে নির্ধারিত হয় জৈবিক ও সামাজিক কারণ দ্বারা। সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল যে, এদেশে জন্মের সময়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। লিঙ্গানুপাতে ভারতে বৈষম্যের অবকাশ বরাবরই আছে। কিন্তু বর্তমানে গভীর উদ্বেগজনক কথা হল এই যে, নারীর সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। লিঙ্গানুপাতের এই বৈষম্য কিছুটা মনুষ্য কর্তৃক সৃষ্ট। বর্তমানে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করার একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি **'Ammeocentesis'** ডাক্তারি মহলে চালু আছে। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে রোগমুক্ত বিকলাঙ্গ সন্তান না জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে এবং হয়েছে। গুজরাট রাজ্যে ১৯৯০ সালে লক্ষাধিক কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সূচক হিসেবে গণ্য করা হলেও উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি কিন্তু কন্যা ভ্রূণহত্যা' র কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিষম লিঙ্গানুপাতের পথকে প্রশস্ত করছে। সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে এই বিষম লিঙ্গানুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।।

২/ (ঙ)প্রশ্ন ঃ–অশোক মেহতা কমিটির মূলসুপারিশগুলি কী কী ?

উঃ– পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম অনুসন্ধান ও তাদের আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয় অশোক মেহতা কমিটি নিযুক্ত করে। ১৯৭৮ সালে এই কমিটি তার প্রতিবেদন প্রদান করে, যার সুপারিশগুলি হল নিম্নরূপ ঃ —

(ক) রাজ্যস্তরের নীচে জেলাগুলি থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত হবে।

(খ) পঞ্চায়েতী রাজ হবে দুটি স্তরে — (অ) জেলাস্তরে হবে জেলা পরিষদ, এবং (আ) মণ্ডল পঞ্চায়েত। কিছু সময়ের জন্য ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত কাজ চালাবে।

(গ) জেলা পরিষদ দু -প্রকার সদস্য নিয়ে গঠিত হবে নির্দিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সদস্য। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পৌরসভার মনোনীত সদস্য দুজন মহিলা সদস্য। জনসংখ্যার ভিত্তিতে তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(ঘ) ১৫,০০০ - ২০,০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি মণ্ডল পঞ্চায়েত থাকবে। ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট মণ্ডল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রামীণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয় কৃষক, দুজন মহিলা, তফশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আসন - সংরক্ষিত থাকবে। সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(ঙ) পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ করতে পারে। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই স্থানীয় স্তরে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে যায়।

(চ) পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে, রাজ্য সরকার এইনির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে পারে না। এই নির্বাচন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

(ছ) জেলাস্তর থেকে পঞ্চায়েতের দিক, পুঁজিবন্টন ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা হয়।

(জ) রাজ্যসরকার দলীয় কারণে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করতে পারে না, যদি কখনও এমন করার প্রয়োজন হয় তাহলে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।

২/(গ) প্রশ্ন ঃ–পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলীগুলি কী কী ?

উঃ– ***ভূমিকা ঃ*** আক্ষরিক অর্থে 'পরিকল্পনা' বলতে বোঝায় ভবিষ্যতের জন্য কৌশল রূপায়ণ। অর্থনীতির পরিভাষায় পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি দেশের সম্পদ ভাণ্ডারে বর্তমান অবস্থা ও এই সম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতের জন্য ধার্য লক্ষ্যমাত্রাগুলি সাফল্যের সাথে অর্জন করা যায়। আবার, অনেকে উল্লেখ করেন যে, পরিকল্পনার মূল কথাই হ'ল অর্থনীতির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ।

AMBITION

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলী প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন —

১।দেশের আভ্যন্তরীণ, প্রাকৃতিক, পুঁজিগত ও মানবিক সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা এবং অপর্যাপ্ত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিচার ও বিশ্লেষণ করা।

২।দেশের সম্পদের কার্যকর ও সুষম ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩।পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় বন্টনের সুপারিশ প্রদান করা।

৪।অর্থনৈতিক উন্নয়ণের পথে যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা নির্ণয় করা এবং প্রতিবন্ধকতা বিলোপ সাধন কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা।

৫।পরিকল্পনার প্রত্যেকটি পর্যায়ের কর্মসূচী যাতে সফলভাবে রূপায়িত করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করা।

৬ ।পরিকল্পনা'র প্রতিটি স্তরের রূপায়ণের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অনুসৃত নীতি ও কার্যপদ্ধতির কোনও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে তা সুপারিশ করা ।

৭ ।দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, উন্নয়ণে গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির ভিতরকার দুর্বলতা দূরীকরণ করা সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান করা ।

৮ ।কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোন্ বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত মতামত চাইলে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত সুপারিশ প্রদান করা ।

মূল্যায়ন ঃ সর্বশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন একটি পরামর্শদান সংস্থা । অশোক চন্দের ন্যায় অনেকেই অভিযোগ করেন যে, পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শ দান সংস্থা হয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক বিধি ও বিধানকে অতিক্রম করে তার কাজ পরিচালনা করেন । অধ্যাপক গ্যাডগিল্ উল্লেখ করেন যে, কমিশনের কার্যকলাপ বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা প্রভাবিত করা হয় । আবার, এই অভিযোগও করা হয়েছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের গঠন ও ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও নীতির পরিপন্থী । কমিশনের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নাই ।

তথাপি কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । অনেকে এই মত প্রদান করেন যে, অর্থনৈতিক কমিশনের ন্যায় এই কমিশনকেও সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা প্রয়োজন । রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্প্রসারণের সাথে সাথে পরিকল্পনা কমিশনের ন্যায় সংস্থার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।।

২ . ঘ) প্রশ্ন ঃ- **আদিবাসী কৃষকদের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন ।**

উত্তর ঃ- প্রকৃতি আদিবাসীদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে । তাই ভারতে আদিবাসীদের ইতিহাস এই গোষ্ঠীর কৃষক হয়ে ওঠার ইতিহাস । এরা মূলতঃ কম চাষে অভ্যস্ত কিন্তু সরকারী নীতি হল ঝুম চাষের বিস্তার যথাসম্ভব হ্রাস করা ফলে আদিবাসী কৃষকেরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যদিও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে । তবুও আদিবাসী কৃষকেরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলি হল -

(১) উৎপাদিত ফসল অবিক্রি ঃ- বর্তমানে স্থায়ী কৃষিকার্যের অধিকাংশই জীবিকা নির্বাহের স্তরেই সীমিত এবং আদিবাসীদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকাংশই বাজারে বিক্রির সুযোগ পায় না । অনেক সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার জন্য তারা শস্য আপতকালীন ভিত্তিতে বিক্রয় করতে বাধ্য হয় ।

(২) ভূমি - ক্ষুধা ঃ- আদিবাসী কেন্দ্রীভবনের মধ্যাঞ্চলে উন্নয়ণ প্রক্রিয়ায় মূল বিষয় হল কৃষিসংক্রান্ত বিয় । পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির অভাব ও ভূমি - ক্ষুধা লক্ষ্য করা যায় এর কারণ হল - বলশালী রাজপুত, মারাঠা, ও অন্যান্য হিন্দু কৃষক সম্প্রদায় দ্বারা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের বহিস্কার । ভূমি - ক্ষুধার অন্যতম সহযোগী কারণগুলি হল ভূমির কম উৎপাদনশীলতা । আদিম পদ্ধতিতে চাষ । আদিবাসী স্বার্থ রক্ষার্থে কোন আইনী ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য জাতের দ্বারা আদিবাসীদের ক্রমাগত শোষণ ও আদিবাসী অর্থনীতির অ - বিভিন্নতা ।

(৩) ভূমি - বিচ্ছিন্নতা ঃ- মধ্যভারতের সব অঞ্চলেই আদিবাসীদের হাত থেকে অ - আদিবাসীদের মধ্যে ভূমি বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় আইনী ব্যবস্থা ত্রুটি যুক্ত হওয়ার কারণে । আদিবাসী অঞ্চলে কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের কাছে কোনো পুঞ্জীভূত উদ্ধৃত্ত নেই এবং খরা প্রবণ এলাকায় বর্ষা না হলে অপরিমিত দুর্দশার সৃষ্টি হয় ।

(৪) ঋণগ্রস্থতা ঃ- সমগ্র আদিবাসী এলাকাতে 'নগদ - ধারে'র সাবেকী প্রথা শোষণের এক চরমতম রূপ । ঋণগ্রস্থতার অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য হল দাস মজুরী । অনেক স্থানেই এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে । আইনি প্রতিকার দ্বারা দাস - মজুর প্রথার বিলোপের প্রচেষ্টা চালানো হলেও এই সত্য উপলব্ধি হয় নি যে, সনাক্তকরণ ও পুনর্বাসন দাসত্ব থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ।

৩/ জ) প্রশ্ন ঃ–'নগরায়ণ' কাকে বলে ?

উঃ–'নগরায়ণ' বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়াকে যার মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহর এলাকায় জন প্রচরণ, ঘনবসতি গড়ে তোলা, অকৃষিভিত্তিক জীবিকার প্রাধান্য, জীবিকার প্রয়োজনে কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার জটিল সম্পর্কে বন্ধন, অধিকমাত্রায় শ্রমবিভাজন ও পেশার বিশেষীকরণ, বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা ও পরিবর্তিত মূল্যবোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । অ্যান্ডরসনের মতে, নগরায়ণ বলতে শুধুমাত্র শহরাভিমুখী জনপ্রচরণকে না বুঝিয়ে তৎসহ অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আচরণগত পরিবর্তনকে বোঝায় । প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, নৈর্ব্যক্তিকতা, ব্যক্তি পরিচয়হীনতা, খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক পরিণতি নগরায়ণেরই ফল । বর্তমানে নগরের স্বীকৃতি পেতে হলে জনসংখ্যা নূন্যতম পাঁচ হাজারের মতো হতে হবে । এই জনসংখ্যার অন্ততঃ ৭৫ শতাংশকে অকৃষি কাজে যুক্ত থাকতে হবে । প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমপক্ষে এক হাজার হতে হবে ।

AMBITION

নগরায়ণের কারণ দর্শাতে গিয়ে চিন্তাবিদ্দের মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । কারও কারও মতে, গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশের কারণেই প্রধানতঃ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে বাধ্য হয় । আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, নগর জীবনের নানারকম বাস্তবিক এবং কাল্পনিক সুযোগ -সুবিধার আকর্ষণেই মানুষ শহরবাসী হয় ।।

৩/ ঘ) প্রশ্ন ঃ–'তফশিলী উপজাতি' কাদের বলা হয় ?

উঃ–তফশিলী জাতি বলতে সেইসব সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদেরকে বোঝায় যারা হিন্দু বর্ণাশ্রমের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থিত, তারফলে এরা নানা ধরণের শোষণের শিকার হয়েছিল । এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অনগ্রসর শ্রেণির বিকাশের জন্য সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল । ১৯০১ সালের পর থেকে হিন্দু আধিপত্য সামাজিক সংস্কারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যায় ।

১৯০৮ সালের পর বিভিন্ন লেখক মনে করেন যে, অস্পৃশ্যরা সংখ্যায় ৫ কোটি বা তার বেশি । ১৯১১সালের আদমসুমারী অনুযায়ী হিন্দু

জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ অথবা সমগ্র জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হল অস্পৃশ্য। ১৯৩৫ - ৩৬ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার বিধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তফশিলী জাতিদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা তফশিলীজাতি সংক্রান্ত একটি আদেশ প্রদান করে যা মূলতঃ ১৯৩৬ -এর তালিকার সমতুল্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তফশিলী জাতির জনসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটিতে।

তফশিলী জাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তি হল জাত, একটি জাতি ও একটি রাজ্যে তফশিলীভুক্ত হতে পারে। আবার, অন্য প্রতিবেশি রাজ্যে তা নাও হতে পারে। তফশিলী জাতির জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই দরিদ্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তফশিলী জাতির ৫২ শতাংশ হল ভূমির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক, ২৮ শতাংশ হল কৃষক (মূলতঃ ক্ষুদ্র চাষী)। পশ্চিম অঞ্চলে অধিকাংশ তাঁতি তফশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বাঞ্চলে সব মৎস্যজীবিরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।।

৩/খ) প্রশ্ন ঃ—**'GREEN HOUSE EFFECT' / 'গ্রীন হাউস এ্যাফেক্ট' কী ?**

উত্তর ঃ— পৃথিবীতে যে সমস্ত সমস্যা বর্তমানে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে 'গ্রীন হাউস এ্যাফেক্ট' তার মধ্যে অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে শীতপ্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকে, সেখানে উদ্ভিদ প্রতিপালনের জন্য স্বচ্ছ কাঁচের ছাউনি যুক্ত ঘর ব্যবহার করা হয়। একে ''গ্রীন হাউস এ্যাফেক্ট' বলা হয়।

সূর্য থেকে আগত রশ্মি এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গের ইনফারেট রশ্মি। এই ঐসব কাঁচের মধ্য দিয়ে গ্রীন হাউসে সহজে প্রবেশ করে। কিন্তু মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাপীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে কাঁচ অস্বচ্ছ বস্তুর ন্যায় আচরণ করে, ফলে তাপ কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের বায়ুমন্ডলে ফিরে যেতে পারে না। ফলে কাঁচের ঘরের তাপমাত্রা বাড়ে। এবং নিয়ন্ত্রিত উষ্ণতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ,ফুল, ফল ভালো হয়। কিন্তুসমগ্র পৃথিবীর পরিমন্ডল বর্তমানে এক গ্রীন হাউস CO_2, CH_4, CFC, N_2O ইত্যাদি। পৃথিবীকে ঢাকনার মধ্যে রেখে ইনফারেট রশ্মিগুলিকে শোষণ করে আটকে দেয় এবং বায়ুমন্ডলকে উষ্ণতর রাখে। তাপমাত্রা জনিত এই সমস্যাকে গ্রীণ হাউস প্রভাব বলা হয়।।

৩/ ঙ) ঝুমচাষ কি ঃ–

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রণালী গড়ে উঠেছে। আদিম কৃষি ব্যবস্থার আদিরূপ কৃষি ব্যবস্থা হিসেবে অন্যতম কৃষি ব্যবস্থা স্থানান্তরী কৃষিব্যবস্থা এই কৃষি ব্যবস্থা প্রধানত ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্য অঞ্চলে আফ্রিকা মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আদিম জাতিভেদের মধ্যে প্রচলিত। তবে ভারতেও স্থানান্তরী কৃষিকাজ বিভিন্ন রাজ্যে ও বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন কেরলে পোনম, মধ্য প্রদেশে মশান, বেওয়ড়, বীরা উত্তর পূর্ব ভারতে ঝুম বা জুম বা দহি নামে উল্লিখিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে ধান, ভুট্টা ও অন্যান্য মিলেট জাতীয় শস্য এরূপ ব্যবস্থায় জন্মায়।

স্থানান্তর কৃষি ব্যবস্থয় অনুন্নত জনগোষ্ঠী প্রাচীন পদ্ধতিতে ফসল ফলায় এবং ফসল উৎপাদনের জমি নির্ধারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়। স্থানান্তর কৃষির অন্তর্গত এরূপ চাষের বৈশিষ্ট্য হল প্রথমতঃ সদ্য পরিস্কৃত জমিতে পরপর কয়েক বছর চাষ করে অপর জমির খোঁজে যায়। সেই কৃষিযোগ্য জমির জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত ঃ এরূপ জমিগুলি আয়তনে ছোট।

তৃতীয়ত ঃ বনভূমির একাংশ পুড়িয়ে কৃষি ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই এইরূপ কৃষি ব্যবস্থা ছেদন বা দহন কৃষি ব্যবস্থা।

চতুর্থত ঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে লোকালয় থেকে দূরে এই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে.

পঞ্চমত ঃ এরূপ কৃষি কাজে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ হয় না।

ষষ্ঠত ঃ এই কৃষিকাজে পশুর ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়াও বলা যায় এরূপ কৃষি কাজে যেমন কোন ব্যক্তিগত সত্ত্বা থাকে না তেমনি এরূপ কৃষিকাজ সম্পূর্ণ জীবিকা সত্তাভিত্তিক অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল নিয়ে বাণিজ্য করা হয় না।

এরূপ কৃষি ব্যবস্থা যেসকল সমস্যা তৈরি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – অরণ্য ছেদন, মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায় মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন, জীবনযাত্রার মান অনুন্নত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়।

AMBITION

BDP
Assignment Solution
Dce. 2012 & June 2013

Foundation Course in Environmental Studies (ENVS)

1.সঠিক উত্তরটি (√) চিহ্নিত করুন-

a) জলবাহিত একটি রোগের নাম - কলেরা
b) বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ - 20.94 %
c) ভারতের পরিবেশ আইনের প্রথম প্রবর্তন হয় - কলকাতায়
d) বিশুদ্ধ জলের সঠিক pH হল - 7
e) আন্তর্জাতিক এডস্ দিবস কবে পালিত হয় - ১লা ডিসেম্বর
f) জলাভূমি অঞ্চলে বা জীবদেহের পচনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস - CH_4
g) চেরনোবিল দুর্ঘটনা কত সালে হয়েছিল ? - ১৯৮৬
h) তাজমহলের মার্বেল গাত্রে ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটেছে কোন্ গ্যাসের প্রভাবে - SO_2
i) জলবাহিত একটি রোগের নাম - কলেরা

২.a) ডি-নাইট্রফিকেশন ঃ–

এই প্রক্রিয়ায় মাটির নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট যৌগ সিউডো মোনাস, থিয়োব্যালিসলাস প্রভৃতি ডিনাইট্রিফাই; ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে পুণরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয় ও বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রাইট বা নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়, তাকে ডি নাইট্রিফিকেশন বলে।

২.b) দ্রাব্য অক্সিজেন ঃ–

জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি জলে দ্রবীভূত বা জলে দ্রাব্য অক্সিজেনকে শ্বাস গ্রহণের কাজে ব্যবহার করে। তাই উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণ ওই সব প্রানীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় BOD মাত্রা রূপে। জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ এবং বায়ুর O_2 হল জলে উপস্থিত অক্সিজেনের উৎস। একেই দ্রাব্য অক্সিজেন বলা হয়।

2. d) **জল দূষনের দু'টি উৎসের নাম ঃ-**

i) জৈব আবর্জনা যেমন - গাছের পাতা, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ পচনের ফলে পচনশীল সূক্ষ্ম জৈব কণা রোগজীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটরিয়া প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে।
ii) পারমাণবিক অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি সমুদ্রতলে পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফোরণ করার ফলে প্রবল সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ও দীর্ঘস্থায়ী রাসায়নিক দূষণের সৃষ্টি হয়।

2.f) 'অ্যারোসেল' (Aerosol) ঃ

উত্তর ঃ বায়ুমণ্ডলের অন্য একটি উপাদান হল ধূলিকণা, মরু অঞ্চল ও সমুদ্র তীরের অতি সূক্ষ্ম ধূলো, বালি, অতি ক্ষুদ্র খনিজ লবণ, বিভিন্ন কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত ছাই, ভস্ম প্রভৃতি ধূলিকণা রূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। এ দের একত্রে অ্যারোসল (Aerosol) বলা হয়।

2.e) **শক্তির স্থানান্তকরণ ঃ–**

উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথম শ্রেণির খাদকের এবং পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণির ও তৃতীয় শ্রেণির খাদকের দেহে প্রবাহিত বা স্থানান্তরিত হয়। সর্বোপরি বিয়োজন মৃত খাদক সমূহকে বিশ্লিষ্ট করে পুণরায় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে শক্তির স্থানান্তকরণ বলে।

2.g) লা - নিনো ঃ–

স্প্যানিশ শব্দ লা নিনার অর্থ হলো ছোট্ট বালিকা। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল বায়ু প্রবাহ হবার ঘটনা লা-নিনো নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে আয়ন বায়ু শক্তিশালী বায়ু পেরু ও ইকুয়েডর উপকূলে নীচ থেকে শীতল প্ল্যাকটন সমৃদ্ধ জলস্রোত উপরে আসে এবং সমুদ্রপৃষ্ট তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। লা-নিনোর প্রভাবে উলটোভাবে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তথা ইন্দোনেশিয়া। উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভালো বৃষ্টি হয়।

2.h) শান্ত মণ্ডলীয় ওজোন স্তর ঃ–

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০-৩৫ কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরকে শান্তমণ্ডল বলা হয়। বায়মণ্ডলের অক্সিজেন (O_2) গ্যাসের অনু এই অংশে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে ভেঙে যায় এবং তিনটি অক্সিজেন পরমণু পুণর্বিন্যাস্ত হয়ে উজেনা অনু (O_3) গঠন করে।

2.i) প্রাকৃতিক পরিবেশ যে যে উপাদান দিয়ে গঠিত তা তিন প্রকার ঃ–

১) অজৈব বা ভৌত উপাদান ঃ–

ইহা পৃথিবীর কঠিন অংশ বা শিলামণ্ডল, তরল অংশ বা বারিমণ্ডল এবং গ্যাসীয় অংশ বা বায়ুমণ্ডল নামে পরিচিত।

i) শিলামণ্ডল ঃ– শিলামণ্ডলের যে সব নীচু অংশ জলপূর্ণ হয়ে মহাসাগর, নদী, হ্রদ, কালবিল প্রভৃতি জলভাগ সৃষ্টি করেছে তাকে একসাতে বারিমণ্ডল বলে।
ii) বায়ুমণ্ডল ঃ– ভূ-পৃষ্ট থেকে প্রায় ১০,০০০ কিমি ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত যে গ্যাসীয় আবরন পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

2. J) 'মিস্ট কী' ?

উত্তর ঃ বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প বা প্রক্রিয়াজাত কারণে উৎপন্ন বাষ্পের ঘণীভবনের ফলে সুক্ষ্ম ও তরল কণার সৃষ্টি যা বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। কনার মাপ ০.৫ মাইক্রন থেকে ৩ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

AMBITION

2. m) অম্লবৃষ্টি

বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও ভাসমান ধূলিকণাগুলি জলের সাথে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড (H_2SO_4) তৈরী করে। কয়লা, খনিজতেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট সালফার (S) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেন আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) বায়ুতে মিশে থাকা (HCL) -এর সাথে মিশে অম্লবৃষ্টি ঘটায়।

2.o) তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে বায়ু দূষণ করে ?

পরিবেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির কিছু স্বাভাবিক উৎস আছে। যেমন উল্কাপাত ইত্যাদির মাধ্যমে বাইরে থেকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে মেশা, পরিবেশে উপস্থিত কিছু বিশেষ ঋতু বা ধাতব যৌগ থেকে নিঃসৃত আনবিক দূষণের পরিমাণ নগন্য। পারমাণবিক গবেষণাগার, কারখানা বা চিকিৎসাকেন্দ্র বা সুরক্ষা পরীক্ষায় ব্যবহৃত X-ray তেজস্ক্রিয় ডায়ালযুক্ত ঘড়ি, লোর, টচ প্রভৃতি থেকে আধিক বিকিরণ এবং বিশেষতঃ পারমানবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

2.p) ভারতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ ?

উত্তর ঃ- পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। অতি ব্যাপকহারে পৃথিবীর সাতটি মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ হল–

১। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়া।
২। মৃত্যুহার কমে যাওয়া।

৩। দ্রুত জন্মহার বেড়ে যাওয়া।
৪। চরম দারিদ্রতা।
৫। বেকারত্ব / বেকারী।
৬। অনাহার ও পুষ্টি।
৭। শিথিল জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন।
৮। কৃষির উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন
৯। শিল্প উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন।
১০। বিজ্ঞাবনের চরম উন্নতি
১১। অশিক্ষা।

2.q) বৃক্ষছেদন বলতে কি বোঝ ?

উত্তরঃ- পৃথিবীর বনাঞ্চল মানুষের কাছে অমূল্য সম্পদ, কারণ এগুলি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সঠিক মান সংগ্রহ করে। দেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতর মানুষের জীবিকার ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করে এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে অতি দ্রুতহারে অরণ্যভূমি হ্রাস পাচ্ছে, অতি নগরায়ণ, শিল্প স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কারণে বন ভূমি দ্রুত ধ্বংস করা হচ্ছে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৩.৪ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে।

3. a) শব্দ দূষণ

শব্দ দূষনের বিভিন্ন উৎস ঃ–

শব্দ দূষণের বিভিন্ন উৎস সমূহকে প্রধাণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা- (১) পরিবহন জনিত, (২) শিল্পজাত, (৩) গৃহাভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপকৃত শব্দ দূষণ।

১) পরিবহন জনিত শব্দ দূষণ ঃ–

ভূতল, বিমান ও রেলপথে পরিবহন সৃষ্ট শব্দ, শব্দদূষণের প্রধান কারণ। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠেছে যানবাহনের নিরন্তর বৃদ্ধি। এই যানবাহনের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত শব্দ, শব্দদূষণকে বর্ধিত করে চলেছে।

শহরাঞ্চলে যানবাহনের আধিক্য বেশি হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের তাড়াতাড়ি শব্দদূষনে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২) শিল্পজাত শব্দ দূষণ ঃ-

বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত মেশিন চালাবার শব্দ এবং এসব শিল্পে সংগঠিত নানাবিধ প্রক্রিয়া দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ধরনেরদূষণের শিকার কর্মরত শ্রমিকেরা এবং শিল্প সংলগ্ন এলাকার মানুষেরা।

৩) গৃহাভ্যন্তরীন ও পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপকৃত শব্দদূষণ ঃ–

ঘরের ভিতরে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম যেমন- জেনারেটর, জলের পাম্প, ওয়াশিং মেশিনের একটানা আওয়াজ, টি.ভি., রেডিও, টেপ রেকর্ডারের উচ্চস্বরে চালানোর শব্দ। পারিপার্শ্বিককে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ আওয়াজ শব্দদূষন সৃষ্টিকারক।

3. b) জীব বৈচিত্রের সংকট ঃ–

১৯৮৬ সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রতিদিন ৫০টির মত প্রজাতি পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে ও যথেচ্ছভাবে ব্যবাহরের ফলে সপুষ্পক উদ্ভিদের মোট ১০% প্রজাতী আজ বিলুপ্তপ্রায় রূপে চিহ্নিত। হিসেব করে জানা গেছে ৪০০০ বছর পূর্বে পৃথিবী পৃষ্ঠে ৬০ কোটি হেক্টর বনভূমি ছিল। এই পরিমাণ কমতে কমতে বর্তমানে (২০০১) ৩৬ কোটি হেক্টর দাঁড়িয়েছে।পৃথিবীতে যত ধরণের প্রজাতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই পাওয়া যায় বনভূমিতে। ভারতে গত ২০-৩০ বছর ধরে অস্বাভাবিক হারে বনভূমি নষ্ট হয়েছে–গড়ে বছরে প্রায় ১ শতাংশ হারে। ফলে বহুসংখ্যক পাখি, সরিসৃপ ও উভয়চর প্রজাতী আজ সম্পূর্ন বিলুপ্ত হতে চলেছে। ভারতবর্ষে ৩৪০টি স্তন্যপায়ী প্রজাতীরত মধ্যে ২১টি প্রাণি বিলুপ্তর পথে। ১৯৮৭ সালে বোটিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (BSI) রেকর্ড ডাটা বুক এর তথ্য অনুসারে অবলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা ১১৪, ৩৩ ও ১৫৭। তাছাড়া সংবেদনশীল উদ্ভিদের সংখ্যা ১৪।

জীব বৈচিত্রের এই বিনাশ বা বিলুপ্তি নানা ধরনের হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রদান বিলুপ্তির কারণ। তবে ভূত্বাত্বিক সময়ের সাপেক্ষে প্রজাতির বিলুপ্তির হার তুলনামূলক ভাবে কম। বিজ্ঞানীদের মতে, একটি প্রজাতির আয়ু ৫০ লক্ষ থেকে। কোটি বছর। সেই হিসেবে পৃথিবীর মোট প্রজাতির সংখ্যা ১.২-১.৩ কোটি এবং ওই বছর বিলুপ্তির হার ১-৩ টি প্রজাতী।

বিগত ৪০০ বছরে পৃথিবীব্যাপী মানুষের আধিপত্যের কারনে প্রজাতী বিলুপ্তি সবচেয়ে বেশি হয়েছে।

3.c) চিপকো আন্দোলন ঃ–

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। 'চিপকো' কথাটির অর্থ 'আলিঙ্গন'। বিত্তবান ঠিকাদার এবং শিল্পপতিদের নির্বিচারে বনভুমি ধ্বংস এবং বনসম্পদ লুন্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারের লোকেরা গাছ কাটতে এলে আদিবাসী মায়েরা প্রতিটি বৃক্ষকে সন্তানের মত জড়িয়ে থাকেন। রাতের পর রাত জেগে গাছ পাহারা দিয়েছেন এই মহিলারা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা বেন, মীরা বেন, সুন্দরলাল বহুগুনা, চন্দ্রিকা প্রসাদ ভাট ইত্যাদি পরিবেশবিদ্রা। বহুগুনার নেতৃত্বে শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ৩০০ কিমি পদযাত্রা করা হয়।তিনি পরবর্তিকালে অনশনেও বসেন। এগারো দিনের মাথায় বহুগুণাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খবর পেয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে এবং তার চাপে পুলিশ বাহিনী পশ্চাদপসরন করতে বাধ্য হয়।

বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগণা, ছত্তিশগড়, থানে এংব আরাবল্লী অঞ্চলেও আন্দোলন শুরু হয়। বহু মানুষ পদযাত্রা করে কেলমি অরণ্যে গাছকে জড়িয়ে দরে ঠিকাদারের কুঠারঘাত থেকে তাদের রক্ষা করে। এতে ঠিকাদাররা ভীত হয়ে পড়ে এবং চতুর্দিক থেকে এই আন্দোলন সমর্থন পায়।

চিপকো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৃত্তিকা ও জলসংরক্ষণের জন্য হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ নিধন নিষিদ্ধ করা হয়। গাছ আমাদের জ্বালানি বা আসবাবপত্রের কাঠ জোগাড় দেবার জন্য জন্মায়নি। মৃত্তিকা, জল সংরক্ষণ এবং মানুষকে তাঁর বাঁচার অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য সম্পদ হল ভগবান প্রদত্ত উপহারস্বরূপ। পশুখাদ্য সংগ্রহ ও হাল্কা জ্বালানি সংগ্রহে মায়েদের অধিকার থাকবে। ততাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসী মহিলাদের পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অরণ্য রক্ষার পাশাপাশি, অরণ্য প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশও সংরক্ষণও তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

AMBITION

3.e) অ্যান্টার্কটিকা ওজোন ছিদ্র ঃ-

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু কোনো কারনে ওজোনের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের হার বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে ওজোনস্তর ক্রমশঃ পাতলা হবে। ফলস্বরূপ তৈরী হলে ওজোন গর্ত। কিন্তু এই ওজোন ক্রমশঃ কমে যাবার কারণকী ? এর কারণ হিসেবে রসায়নবিদের যেসবতথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্লোরিন দৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সবচেয়ে আদর্শ জায়গা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।

অ্যান্টার্কটিকায় ৬ মাস শীতকাল থাকে। ওই সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতকালীন তাপমাত্রা নেমে যায় -৮৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে তা আবার ১১ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে তাই এই নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় সমস্ত দূষক গ্যাস জমাট বেঁধে কেলাসাকারে পোলার স্ট্র্যাটিস্ফিরিক মেঘে পরিণত হয় এই সময় জমাট বাঁধা প্রধান দূষণ গ্যাসগুলি হল হাইড্রো ক্লোরাইড (HCL) জলীয় বাষ্প (H_2O), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2), এবং ক্লোরিন নাইট্রেট ($CINO_3$) এই অবস্থায় এর সাথে এর বিক্রিয়ায় ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রচণ্ড স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের দিকে সঞ্চিত হয়।

বসন্তের শুরুতে সূর্যকিরণে আবির্ভাব হয় এবং ক্লোরিন অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন পরমানূতে পরিণত হয় (CI) যা প্রবল বিক্রমে অনুঘটকীয় ক্রিয়াবিধিতে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে চলে। তৈরী হয় 'ওজেনা হোল' বা 'ওজোন গর্ত'।

৩ .f)প্রশ্ন ঃ- 'জলচক্র' কাকে বলে ?

উত্তর ঃ- জল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন প্রথম তরল পদার্থ। বাষ্পভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপন - এই তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরামহীনভাবে চক্রাকার আবর্তিত হয়। প্রথম প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভনের মাধ্যমে ভূ-ভাগের ও জলভাগের জল আকাশে উঠে যায় জলীয় বাষ্পরূপে। অনুকূল পরিবেশে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি বা তুষার আকারে পৃথিবীতে অধঃক্ষেপিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে জলচক্র বলা হয়।